শিব্রাম রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনায়

শিবরাম চক্রবর্তী

বলে গেছেন উপনিষদ
আরাম নাহি অল্পে।
বাড়ি-শুদ্ধ সবার আমোদ
শিবরামের গল্পে।।

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

পরিচয়

যে কোনো কারণেই হোক হাসির লেখা ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হতে বসেছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও। এর একটা কারণ, হয়তো অতিমাত্রায় কলকারখানার প্রসার হওয়ায় জড়বাদী জগতে হাসির অবকাশ বিশেষ নেই, তাই ধীরে ধীরে হাস্যরসের অবলুপ্তি ঘটছে।

অথচ, অন্য কোনো দেশের কথা থাক, এই বাংলাদেশে হাসির অভাব কখনো ঘটেনি, অন্নের অনটন ঘটেছে, মহামারীর আক্রমণে দেশ বিপর্যস্ত হয়েছে। তবু জননীরা দুষ্টু খোকাকে ঘুম পাড়ানোর সময় বর্গীদের কীভাবে খাজনা দেবেন তা ভেবে আকুল হয়েছেন। কারণ, সব ধান বুলবুলিতে খেয়ে গেছে। সামান্য কথা, কিন্তু গভীর অর্থে ভরা—আর তার ফলেই অসামান্য হয়ে উঠেছে।

আমরা দেখেছি, সাধারণ পল্লীর মানুষ, চাষি, নিরক্ষর মেহনতী মানুষ, সকল শ্রেণীর বাঙালির মুখে মুখে কেমন সহজ সরস কথা। ইদানীং অবশ্য সে সব বিরল হয়ে এসেছে। এখন সবাই যেন মারমুখো, রসিকতা বুঝতে না পারা এবং করতে না পারাটা একটা ব্যাধি-বিশেষ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বয়ং সুরসিক ছিলেন, তাই তিনি রঙ্গভরা বঙ্গদেশ বলতে পেরেছিলেন। শিবরাম চক্রবর্তীকে আমি প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল ধরে জানি। তাঁর জীবনটা যে ফুলে ফুলে ভরা নয় এটা তাঁর অন্তরঙ্গ মহলের সকলের জানা। ইদানীং তিনি ''ঈশ্বর, পৃথিবী ও ভালোবাসা'' ও 'ভালোবাসা, পৃথিবী ও ঈশ্বর' নামক দুখানি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় অনেকখানি দিয়েছেন। তবে এই আত্ম-পরিচয়ের মধ্যেও তাঁর মুখের হাসি চোখের জলকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

এসব কথা এখন থাক, কারণ ধীরে ধীরে শিবরাম চক্রবর্তীর সমগ্র সাহিত্য কর্মের পরিচয় দিতে হবে, স্বাদ গ্রহণ করতে হবে আরো মন্থর ভাবে, তবেই পাওয়া যাবে প্রকৃত পরিচয়।

শিবরাম পঞ্চাশ বছর ধরে লিখছেন। লিখছেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, সাংবাদিক মন্তব্য। অজস্র রচনা। এইসব রচনার ভিত্তি কিন্তু রঙ্গরস নয়, তার প্রমাণ তাঁর 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী', 'যখন তারা কথা বল্‌বে', 'চাকার নীচে' এবং 'মানুষ' ও 'চুম্বন' নামক দুটি কবিতার বই। পরবর্তী খণ্ডে সে সব গ্রন্থাদি সংযোজিত হবে। একজন লেখকের সামগ্রিক বিচার তাঁর সমগ্র রচনায়।

শিবরাম কীভাবে এবং কেন হাসির গল্প লিখতে শুরু করলেন তা বোধ হয় কোনো জায়গায় বলেননি। কিন্তু সরসতা ছিল তার অন্তরে, আর এই আশ্চর্য রসজ্ঞান তাঁকে বাঁচিয়েছে। উদ্ধার করেছে নাগরিক জীবনের কলুষিত আবহাওয়া থেকে, তিনি তাই সকল প্রকার আবিলতা থেকে আপনাকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন, মুক্তারামে তিনি প্রায় সারা জীবন কাটালেন মুক্ত আরামে। এবং তা সম্ভব হয়েছে একটিমাত্র হাতিয়ারের জন্য, তার নাম হাস্যরস।

একদা শিবরাম শুধু বড়োদের লেখাই লিখতেন। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে, অর্থাৎ সাহিত্যিক জীবনের সেই উন্মেষকালে, তিনি লিখেছেন গল্প, যেমন 'দেবতার জন্ম', লিখেছেন নাটক যেমন 'চাকার নীচে', 'যখন তারা কথা বলবে' এবং 'মানুষ' ও 'চুম্বন' নামক কবিতার বই। যা লিখেছেন, যখন লিখেছেন, তখনই তা 'সেনসেসনের' সৃষ্টি করেছে। 'চাকার নীচে' এবং 'যখন তারা কথা বলবে' এই দুটি নাটিকা প্রকাশের পর সম্পাদক ও লেখক মহলের প্রতিক্রিয়া আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তেমনই প্রত্যক্ষ করেছি 'মানুষ' ও 'চুম্বন'-এর সাফল্য।

তবু একদিন তিনি ছোটোদের কথা লিখতে বসলেন। তিনি সবিস্তারে একাধিকবার বলেছেন কি সূত্রে ছোটোদের জন্য লিখতে শুরু করেছিলেন। সে কথার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। শিবরাম স্বয়ং শিশু। শিশু ভোলানাথ কথাটি যেন তাঁর বিশেষণ, তাই তাঁর অজস্র শিশু বন্ধু। জগৎ পারাবারের তীরে যেসব শিশুরা খেলা করে কে তাদের বন্ধু? শিবরাম চক্রবর্তী। তিনি কারো কাকা, কারো মামা। অজস্র তাঁর ভাইপো আর ভাগনের দল। এদের অনেকগুলি তাঁর দেখা, অনেককে তিনি চাক্ষুষ দেখেননি। কিন্তু এদের কথা ভেবেই, এদের জন্যই তিনি লিখেছেন ছোটোদের লেখা।

শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য গোয়েন্দা কাহিনী কিংবা এ্যাডভেঞ্চার বা বেদ-পুরাণের কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ না করে হাসির কথাই বলতে বসলেন।

আর এই হাসির হাওয়া প্রবাহিত হল তাঁর সকল রচনায়, তাঁর চলনে-বলনে, তাঁর আচার আচরণে, প্রতিদিনের জীবনে। তাঁর জীবনটা আসক্তির নয়, অনাসক্তির। তিনি ঘরের মানুষ নন, পরের মানুষ। তাঁর গান পথ চলার গান। অনেক সময় হ্যামেলিন শহরের সেই পায়েড-পাইপারের কথা মনে হয়, বাঁশি বাজিয়ে সে সবাইকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নদীর প্রান্তে। শিবরাম যেন সেই হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা, তাঁর বংশী রবে আমরা সবাই আত্মহারা হয়ে তাঁকে অনুসরণ করছি। তিনি কিন্তু কুত্রাপি বলেননি—মামনুসর। এ তাঁর চরিত্রবিরুদ্ধ। তিনিই যেন সবাইকে অনুসরণ করার জন্য সদাই প্রস্তুত। এঁরই নাম শিবরাম চক্রবর্তী, লেখক, পাঠক, সাধারণ মানুষ, সকলের তিনি আপনজন, পরমপ্রিয় মানুষ।

শিবরামের গল্প পড়া সহজ। পড়ে হাসাও হয়ত সহজ। কিন্তু সহজ কথা সহজে লেখা যায় না। সেই লেখা যেমন কঠিন, তেমনই কঠিন তার বিচার বিশ্লেষণ।

ভূমিকা

ভূমিকা লেখা কেন? পরিচয় দেবার জন্যে?

তাই যদি হয় তাহলে শিবরাম চক্রবর্তীর কোনো পরিচয় দেবার দরকার আছে কি?

অক্ষর পরিচয় যাদের আছে, অর্থাৎ বাংলা হরফটা যারা পড়তে পারে এমন সাত থেকে সাতাশি বছরের কারুর কাছে শিবরাম চক্রবর্তীকে কি চিনিয়ে দিতে হয়!

দীপাবলির রাতে আলোর মালা আর বাজির বাহার দেখিয়ে দিয়ে বলতে হয়, দেখো কি জ্বলছে!

দীপাবলির রাতের আলোর মালা আর বাজির বাহারের সঙ্গে শিবরামের তুলনা করাটা নেহাত অকারণ নয়। তার একটা মানে আছে।

শিবরাম চক্রবর্তী যে এক নয় অনেক এই খবরটা কারুর কারুর হয়তো জানা নেই।

এক শিবরাম চক্রবর্তীকে প্রথম বয়সে কবি হিসেবে জেনেছিলাম। তখনকার দিনেই পাঠকদের চোখ-কপালে-তোলা নামের কবিতার বই-এ তেমনি নিয়ম-ভাঙা কবিতা বার করে সে সকলকে চমকে দিয়েছিল।

আরেক শিবরাম চক্রবর্তী হল প্রবন্ধকার। যেমন তেমন প্রবন্ধ নয়। যা সে লিখেছে তাতে পণ্ডিচেরী থেকে মস্কো পর্যন্ত সাড়া পড়ার মশলা।

কবিতা আর গল্প শিবরাম চক্রবর্তীর হাত থেকে এখনো মাঝে-সাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু আরেক শিবরাম চক্রবর্তী একেবারে আমাদের কাছে হারিয়ে গেছে।

সে শিবরাম চক্রবর্তী নাট্যকার। বাংলা নাটক যখন ছক-কাটা বাঁধা রাস্তায় ঘুরপাক খাচ্ছে শিবরাম চক্রবর্তী তখন দারুণ দুঃসাহসে সম্পূর্ণ নতুন ভাবনা আর নতুন চালের নাটক লিখে বাংলা নাটকের বদ্ধজলায় বাঁধ-ভাঙা স্রোত বইয়েছিল। শিবরামের তখনকার লেখা নাটকের নাম শুনলেই কান খাড়া করতে হয়। একটির নাম ছিল, 'চাকার নীচে' আরেকটির 'যখন তারা কথা বলবে'।

এ সব শিবরামকে কিন্তু এক শিবরামই একেবারে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে।

সে শিবরাম হাসির গল্প লেখে।

সে হাসির গল্প কি রকম কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। সে গল্পের তলায় শিবরামের নামটা দেওয়াও বাহুল্য! এমন সম্পূর্ণ আলাদা স্বাদের মার্কামারা সে সব

গল্প যে প্রথম লাইন পড়লেই কার লেখা তা বুঝতে দেরি হয় না। আর সবটা পড়েও মুখ গোমড়া করে যদি কেউ থাকতে পারে তাহলে সে-ই যাদুঘরে থাকবার যোগ্য।

এ রকম গল্প শিবরাম তো একটা আধটা লেখেনি। আজ কমপক্ষে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সে হাসির গল্প লিখছে। সেই যে কোন সেকালে তার কলম থেকে 'দেবতার জন্ম' হয়েছিল তারপর থেকে সে-কলম থেকে হাসির ফোয়ারা অবিরাম উথলে উঠছে। এতদিনেও তার তোড় এতটুকু কমেনি।

কত গল্প যে সে লিখেছে তা তার গল্পের এই সংগ্রহ থেকেই জানা যাবে। টাস বুনোন ছাপা রীতিমতো মোটা কটা খণ্ডে তা কুলোয় তাই দেখি!

এত গল্প লিখেও আগাগোড়া সেই এক তার আর ধার, সেই হাসির ঝলমলানি আর ভাষার ঝকমকানি বজায় রাখা একেবারে পয়লা নম্বরের জাত-লিখিয়ে ছাড়া আর কারুর সাধ্য নয়।

হাসির গল্প অনেকেই লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যিকেরাও হাসির গল্পের পাড়া অচ্ছুত বলে এড়িয়ে যাননি।

কিন্তু নিছক হাসির গল্প লিখিয়ের সংখ্যা আমাদের ভাষায় খুব বেশি নয়। আমাদের বরাতজোর এই যে হাতে গোনার মতো কজন মাত্র এরকম লেখক পেলেও যাদের আমরা পেয়েছি সবাই একেবারে অদ্বিতীয় অনন্য। ত্রৈলোক্যনাথ মুখুজ্যে, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, পরশুরাম, শিবরাম চক্রবর্তী, নাম গুনতে গিয়ে এখানেই থামতে হলেও এঁরা প্রত্যেকে নিজের নিজের এলাকায় একেশ্বর। আর শিবরাম চক্রবর্তীকে ছোটোদের হাসির গল্পের রাজ্যের রাজচক্রবর্তী বললে কিছু ভুল হয় কি?

শিবরাম চক্রবর্তীর মাপের লেখকদের অসামান্যতার প্রধান লক্ষণ কি? লক্ষণ এই যে গল্পের দুনিয়া তাঁরা অমর কিছু চরিত্র দিয়ে ভরে দেন। পঞ্চানন হারাধন হর্ষবর্ধন গোবর্ধন থেকে, প্রিসিলা ডলুমাসি ইতু ইত্যাদিরা গল্পের অমরাবতীর আদমশুমারি থেকে কোনোদিন বাদ পড়বে কি?

সব শেষে একটা কথা না বললে নয়।

শিবরাম কোথাও কোথাও লিখেছে যে আমার কাছেই নাকি গল্প লেখার হদিস তার পাওয়া।

কথাটা যে আমার প্রতি তার পক্ষপাতের আতিশয্য, তার যে কোনো লেখাই তার প্রমাণ।

মাছকে কি সাঁতার শেখাতে হয়?

কিছু যদি আমি করে থাকি তাহলে তাকে জলে ঠেলে দিয়েছি মাত্র।

সনমস্কার নিবেদন

ছোটোদের রচনাবলির এই প্রথম খণ্ডে আমার সববের গোড়ার দিকের লেখা গল্প কাহিনীর প্রায় সবগুলিই স্থান পেয়েছে ঃ যেমন, পঞ্চাননের অশ্বমেধ, শুঁড়ওয়ালা বাবা, কালান্তক লালফিতা, মন্টুর মাস্টার, হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি—এইসব বইয়ের গল্পগুলি এবং রামধনু পত্রিকায় উপন্যাস-আকারে ধারাবাহিক প্রকাশিত হর্ষবর্ধনদের কাহিনী—কলকাতার হালচাল ইত্যাদি। সেই সঙ্গে , একটি প্রবন্ধ, চারটি নাটিকা—বেতননিবারক বিছানা, মামা ভাগ্নে, ভোজবাজি, তোতলামি সারানোর ইস্কুল; এবং তাছাড়াও ছোটোদের কতকগুলি ছড়া আর কবিতা।

গত অর্ধ শতাব্দী, বোধকরি তারও বেশি কাল ধরে আমি কতো যে যে লিখেছি তার ইয়ত্তা হয় না! এতাবৎ নেহাৎ কম লিখিনি, সত্যি বলতে, ছোটোদের জন্যে লিখে লিখেই এতকাল ধরে টিকে রয়েছি। বলতে গেলে আমার বই কিনে কিনে বাংলার ছেলে-মেয়েরাই আমায় খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে বর্তে রেখেছে। তাই আজ জীবনের শেষ পাদে, এই অন্তিমকালে পৌঁছে সাধ হল যে ছোটোদের জন্যই লেখা তাদের জিনিসগুলি যেন তাদের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারি, কিন্তু সাধ হলেই তে আর সাধ্য হয় না। এবং এই অথর্ব দশায় তা প্রায় অসম্ভবই বোধহয়। তামাম বাংলা মুলুক জুড়ে বাঙালিদের ঘরে ঘরে সেকালের আমার লেখাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার এখন পাত্তা পাওয়া সহজ নয়। সেযুগের বেশির ভাগ বইয়েরই পুনর্মুদ্রণ হয়নি, হিঁড়ে খুঁড়ে কে কোথায় পড়ে রয়েছে কে জানে! তাদের উদ্ধার করে কে!

এমন কালে আমার ভাগনে শ্রীমান গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যে ইতিমধ্যেই আমার নামলাঞ্ছিত এক বইয়ের দোকান ফেঁদে বসেছিল কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে, এই কাজ সম্পন্ন করতে আমার সাহায্যে এগিয়ে এল আর তার সহায় হল তার ভাইপো আমার নাতি শ্রীমান পলি (বিশ্বজিৎ) বন্দ্যোপাধ্যায়—তাদেরই যুগপৎ উদ্যম আর প্রয়াসে বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে এই বই (প্রথম খণ্ড) প্রকাশ পেল। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এবং আরো অনেকের কাছে যে আনুকূল্য পেয়েছি তাও এখানে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবার।

শিবরাম চক্রবর্তী

সার্কাসের ক্লাউন যেমন। সব খেলাতেই ওস্তাদ, কিন্তু তার দক্ষতা খেলো দক্ষতার আড়ালে। সব খেলাই জানে, সব খেলাই সে পারে, কিন্তু পারতে গিয়ে কোথায় যে কী হয়ে যায়, খেলাটার হাসিল হয় না; হাসির হয়ে ওঠে। আর হাসির হলেই তার খেলা হাসিল হয়।

কিন্তু আমি তা পেরেছি কি!

শিবরাম চক্রবর্তী

বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসরসিক সাহিত্যিকদের তালিকায় শিবরামের নাম যেমন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, তেমনই আবার তাঁর পরে আর কারো নাম নেই। তিনিই যেন শেষতম প্রতিনিধি।

দীর্ঘকাল তিনি আসর জমিয়ে বসে আছেন। স্বীয় মহিমায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি একক এবং অনন্য। বিদেশি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনা করার একটা রেওয়াজ আমাদের দেশে আছে, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। শিবরাম নিজস্ব ভঙ্গির জন্যই অনন্যসাধারণ। তাঁর সঙ্গে কারো মিল নেই। মার্ক টোয়েন, উডহাউস, চেস্টারটন, জেমস থারবার, জেরোম কে জেরোম এইসব রস সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর মিল নেই, তবু তিনি তাঁদের সগোত্র। তাঁর মিল আছে চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষীণভাবে আর আর্মেনিয়ান লেখক উইলিয়াম সারোয়ানের সঙ্গে আঙ্গিকের দিক থেকে। দুঃখের বিষয় শিবরামের রচনাবলির অনুবাদ হয়নি। অন্য ভাষায় অনুবাদ করাও কঠিন, তা যদি করা যেত শিবরামের পক্ষে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করা কঠিন হত না।

বাংলা রস সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ সাহিত্যের ইতিহাসে শিবরামের যথাযোগ্য স্থান নির্ণয় করবেন। আমি শিবরামের দীর্ঘকালের গুণমুগ্ধ বন্ধু এবং ভক্ত পাঠক। তাঁর সকল প্রকার এবং সমগ্র রচনাই পাঠ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অনেক রচনা বার বার পড়েছি তবু কখনো ক্লান্তি জাগেনি মনে। শুধু কি আমি, আমি লক্ষ করে দেখেছি ছোটোদের মনে শিবরাম কি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছেন। তারা 'শিবরাম' পেলেই পড়তে বসে। যে কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। আসলে শিবরাম সেই কৌশল জানেন, সেই আশ্চর্য চাবিকাঠি তাঁর হাতে যা দিয়ে সকল মনের দুয়ার খোলা যায়। তাঁর সাফল্যের গোপন রহস্য কোথায়? রহস্য একটা আছে নিশ্চয়ই। শিবরাম যে বস্তু লিখে থাকেন তা গতানুগতিকতামুক্ত, এমন সব জায়গা থেকে গল্প আমদানি করেন যে জগৎ অনাবিষ্কৃত। তাঁর হাসির গল্পের কোথাও স্থূলরসের উদার পরিবেশন নেই। পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত সরসতা শিবরামের সরস রচনাবলির প্রাণশক্তি।

পরিহাসরসিক ও ব্যঙ্গরচনায় একজন সুদক্ষ শিল্পী হিসাবে শিবরাম পরিচিত হলেও তাঁর সাহিত্য রচনার অন্য বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কুশলী ডুবুরির মতো শিবরাম ডুব দিয়েছেন জীবনের গভীরে আর তারপর উঠে এসেছেন মণি-মুক্তায় দুটি হাত পূর্ণ করে।

যে জীবন চল-চঞ্চল, গতি-উচ্ছল, আনন্দ বেদনা, হাসি ও অশ্রুতে ছল ছল সেই মায়ারস অভিষিক্ত সরসতাই শিবরামের প্রধান হাতিয়ার।

ছোটোদের এবং বড়োদের দুই শ্রেণীর পাঠকের জন্যই তিনি হাসির গল্প লিখেছেন। বলা বাহুল্য এই দুটি ধারার মধ্যে পার্থক্য প্রচণ্ড। কিন্তু একথা চিন্তা করলে অন্তরে বিস্ময় জাগে তিনি কেমন অবলীলায় ছোটোদের এবং বড়োদের হাসির খোরাক

সরবরাহ করেছেন। এই যে মিল, এই মিলের জন্যই শিবরাম পাঠক সমাজের কাছে এত প্রিয়। শিশুদের জন্য রচিত গল্পগুলিও বয়স্করা মন দিয়ে পড়ে থাকেন এ আমি দেখেছি। লেখক হিসাবে এ তাঁর পরম প্রাপ্তি।

হাসির গল্পের গোত্র যে আলাদা শিবরাম সে বিষয়ে সচেতন। তিনি বলেছেন—

"হাসির গল্প লিখিয়েও জীবনকে দ্যাখে, জীবন থেকেই নিজের লেখার উপাদান নেয়, কিন্তু তার জীবনদর্শন ঠিক সোজাসুজি নয়, তির্যক। এবং তার দেখানোর কায়দাটাও একটু বুঝি বাঁকানো। রসদৃষ্টির মতো তার রসদৃষ্টিও স্বতন্ত্র, কলাকারুর ধারাও পৃথক। সব কিছুই তার কৌতুকের কোণ থেকে গভীর অশ্রুর সমুদ্র থেকে তার হাস্যোচ্ছ্বাস উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই 'অশ্রুতপূর্ব' কীর্তি যখন কাহিনীর বেলাভূমিতে গড়িয়ে যায়, তখন তা হাসির ঢেউ।"

এই ব্যাখ্যার মধ্যে লেখক সমস্তই খুলে বলেছেন।

প্রথম খণ্ডের গল্পগুলি অনেকেরই হয়তো জানা, অনেকের কাছে হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়ের মতো মনে হবে। কারণ, অল্প বয়সে যাঁরা এসব কাহিনী পড়েছেন, আজ পরিণত বয়সের পরিণত মন নিয়ে পড়ে এর ভিতর পাওয়া যাবে নতুন এক স্বাদ। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। সব গল্পগুলি আবার পড়লাম, আবার হাসলাম, শিবরামের লিপিচাতুর্যের প্রতি মনে মনে ঈর্ষা বোধ করলাম, আর সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ দুঃখও মনে জাগল, হায় এত কিছুর অনুকরণ হয়, শিবরামের অনুকরণে বা অনুসরণে নতুন লেখক সলজ্জ সম্ভ্রমে দূরে রইলেন কেন।

আজ থেকে প্রায় আটচল্লিশ বছর আগে তরুণ শিবরাম রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন—

"জীবন লভিল সবে তোমার জীবনে,
মৃত্যু নাই, মিথ্যা নাই, নাই অন্ধকার,
রবির আলোক হল ভুবনে উদার।
হে কবি, হে নবীন তপন,
স্বপ্ন যে তোমার সত্য,
সত্য তাই তোমার স্বপন।"

এই কথাগুলি কি শিবরাম সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য নয়?

শিবরাম রচনাবলীর সামগ্রিক প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে তাই এক আনন্দ সংবাদ, এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

বেহালা
কলকাতা-৭০০ ০৩৪

সূচিপত্র

◎ পঞ্চাননের অশ্বমেধ ১৭
◎ কাষ্ঠ-কাশির চিকিৎসা ২৩
◎ আমার ভালুক শিকার ৩০
◎ মহাপুরুষের সিদ্ধিলাভ ৩৭
◎ ঘটোৎকচ-বধ ৪৩
◎ মাতুলতা ৪৯
◎ শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী ৫৪
◎ মন্টুর মাস্টার ৬২
◎ আমার বাঘ শিকার ৭১
◎ তারে চড়ার নানান ফ্যাসাদ ৭৬
◎ পরোপকারের বিপদ ৮৭
◎ শুঁড়-ওলা-বাবা! ৯৩
◎ টুনুর পৃথিবী ভ্রমণ ৯৮
◎ হারাধনের দুঃখ! ১০৩
◎ গোখলে, গান্ধিজি এবং গোবিন্দবাবু ১১০
◎ আলেকজেন্ডারের দিগ্বিজয় ১১৫
◎ শিশুশিক্ষার পরিণাম ১২৩
◎ যখন যেমন— ১৩২
◎ মহাযুদ্ধের ইতিহাস ১৩৮
◎ পণ্ডিত বিদায় ১৪৫
◎ অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ! ১৫১
◎ স্বাবলম্বনের অনেক সুবিধা ১৬০
◎ পাতালে বছর পাঁচেক ১৬৬
◎ বিহার-মন্ত্রীর সান্ধ্য-বিহার ১৭৮
◎ প্রকৃতি-রসিকের রসিক প্রকৃতি ১৮৬
◎ নকুড় বাবুর অনিদ্রা-দূর ১৯৭
◎ অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ ২০৫
◎ পৃথিবীতে সুখ নেই ২১৪
◎ কালান্তক লালফিতা ২২৩
◎ হাতির সঙ্গে হাতাহাতি ২৩৪
◎ বেতন-নিবারক বিছানা ২৮৮
◎ পীঠস্থান ৩০৫
◎ এক ভুতুড়ে কাণ্ড ৩১০
◎ গ্যাস-মিত্রতার শোচনীয় পরিণাম ৩১৫
◎ শরীর গরম রাখো! ৩২২
◎ কলকাতার হালচাল ৩২৬
◎ মামা ভাগ্নে ৩৯৪
◎ ভোজবাজি ৪০১
◎ তোতলামি সারানোর ইস্কুল ৪০৭

কবিতা

◎ বাড়িওলার বাড়াবাড়ি ৪১৫
◎ নাম বিভ্রাট ৪১৭
◎ জন্মদিনের রিহার্সাল ৪১৯
◎ শাবাশ দৌড় ৪২০
◎ অমার্জনীয় ৪২২
◎ পৃথিবী বানানো ৪২৪
◎ মার চিঠি ৪২৫
◎ কাঁচা সোনার রোদ ৪২৬
◎ জমা খরচ ৪২৮
◎ মশার মুশকিল ৪৩০
◎ কচি মুখ ৪৩২

পঞ্চাননের অশ্বমেধ

ভালো আপদ হয়েছে ঘোড়াটাকে নিয়ে। পঞ্চানন কি যে করবে কিছুই স্থির করতে পারে না। কলিযুগ হয়ে অবধি আজকাল অশ্বমেধের রেওয়াজ নেই, তা না হলে সে হয়তো একটা অশ্বমেধ যজ্ঞই করে বসতো। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা কৃষ্ণের জীবকে তো অধর্ম করে অমনি মেরে ফেলা যায় না। তাই পঞ্চানন ভেবে রেখেছে সুবিধা পেলেই একবার ভট্টপল্লীর দিকে যাবে—মা কালীর কাছে অশ্ববলি দেওয়া যায় কি না, তার ব্যবস্থাটা জিজ্ঞাসা করবে।

সে মনে মনে আলোচনা করেছে, কেনই বা না দেওয়া যাবে? পাঁঠা যখন দেওয়া যায়—অশ্ব তো পশুর মধ্যেই গণ্য? পাঁঠাও একটা পশু ছাড়া আর কি? পাঁঠার চারটে পা, ঘোড়ারও,—সবদিকেই প্রায় মিল আছে, যা কিছু তফাত তা কেবল লেজের ও আওয়াজের। তা শাস্ত্রেই যখন রয়েছে মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, তখন পাঁঠাভাবে ঘোড়াং দদ্যাতের বিধান কি আর শাস্ত্রে নেই? নিশ্চয়ই আছে।

এক কালে অবশ্য ঘোড়াটা খুবই কাজ দিয়েছিল, কিন্তু বুড়ো হয়ে অবধি আজকাল কোনো কাজেই লাগা দূরে থাক, তার পেছনে লেগে থাকা একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো বয়সে ভারী পেটুক হয়েছে ঘোড়াটা। জামার হাতা, খবরের কাগজ, ছেলেদের পুঁথিপত্র, দরকারি চিঠি, কখন কি খায় স্থির নেই। সেদিন তো কাশ্মীরি শালের আধখানাই প্রায় সাবাড় করে বসল। তা ছাড়া রান্নাঘরের দিকেও বেশ নজর আছে।

এদিকে পঞ্চাননের সঙ্গে তার দস্তুর মতো প্রতিযোগিতা। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক-ছোঁক আওয়াজ কিংবা বেগুন ভাজার গন্ধ এলে কার সাধ্য তাকে থামায়? পাড়াগাঁয়ে মেটে বাড়ি পঞ্চাননদের—ধানের গোলাগুলো ঘুরে উঠোন পেরিয়ে গেলেই রান্নাঘর—মুহূর্তের মধ্যে অশ্ববরকে সেখানে উপস্থিত দেখা যাবে। পঞ্চাননের গিন্নির কি পরিত্রাণ আছে ওকে বেগুন ভাজা না দিয়ে? বেগুন ভাজার প্রতি পঞ্চাননের দারুণ লোভ, অথচ এই ঘোড়াটার জন্যই সে পেট ভরে বেগুন ভাজা খেতে পায় না।

সেদিন পঞ্চানন-গিন্নি বেগুন না ভেজে, বোধ হয় ঘোড়াটাকে ঠকাবার মতলবেই, বেসন দিয়ে বেগুনি ভাজছিলেন। গন্ধ পাবামাত্র ঘোড়াটা সেখানে হাজির। দু-একবার সে গিন্নির মনোযোগ আকর্ষণ করেছে—চি-হি চি-হি!

সংস্কৃত ভাষায় যার মানে হচ্ছে—দেহি দেহি।

কিন্তু গিন্নি কর্ণপাত না করায় সে নাসিকার সাহায্যে গিন্নীকে ঠেলে ফেলে সেই ঝুড়িভরা সমস্ত বেগুনি আত্মসাৎ করে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

সেদিন থেকে ঘোড়াটার প্রতি আর পঞ্চাননের চিত্ত নেই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে ভাটপাড়া সে যাবেই।

গিন্নিকে সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, ফের যদি তুমি ঘোড়াটাকে আশকারা দাও, তাহলে ওরই একদিন কি আমারই একদিন। সত্যি বলছি, একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। ঘোড়াটা কিন্তু গ্রাহ্যও করে না পঞ্চাননকে।

তার পরের দিনই সে কলকাতা থেকে সদ্য আনানো পঞ্চাননের টর্চ লাইটটা মুখের মধ্যে পুরেছিল, কিন্তু ভালো করে চিবিয়ে যখন বুঝল যে ওটা ঠিক বেগুনি নয়, তখন বিরক্ত হয়ে ফেলে দিল।

টর্চ লাইটার অবস্থা দেখে পঞ্চানন তো অগ্নিশর্মা। সে ছুটে গিয়ে ঘোড়াটার কান ধরে গালে এক চড় বসিয়ে দিল—হতভাগা, তোর কি একটুও আক্কেল বুদ্ধি নেই? তুই যে একটা গাধারও অধম হলি?

ঘোড়া মুখ সরিয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছে চিহিঁহিঁ! অর্থাৎ—যা বল তাই বল!

পঞ্চানন যখন মাথা ঘামাচ্ছে, এই হঠকারিতার জন্য কি শাস্তি ওকে দেওয়া যায়, তখন ওর ছোটো ছেলে বটকৃষ্ণ এসে পরামর্শ দিল—বাবা, ওর লেজ কেটে দাও, তাহলে আর মশা তাড়াতে পারবে না।

পঞ্চানন ভেবে দেখল, একথা বেশ। ওর শাস্তির ভারটা মশার উপরে ছেড়ে দেওয়াটা মন্দ না।

কিন্তু কাঁচি নিয়ে উদ্যোগ-আয়োজনের মুখেই ন-মেয়ে রাধারানি বলল, বাবা করছ কি! মশার কামড়ে তাহলে ও আমাদের মশারির মধ্যে এসে ঢুকবে যে।

বাধ্য হয়ে পঞ্চানন কাঁচি থামিয়েছে, একটা ভাবনার কথা বইকি। ঘোড়াটার যে-রকম বুদ্ধি-শুদ্ধির অভাব, তাতে সবই ওর পক্ষে সম্ভব। মশারির মধ্যে ঢোকা কিছু কঠিন না ওর পক্ষে।

এমনই সমস্যার মুহূর্তে জ্যোতি বোস এসে উপস্থিত।—কিন্তু পঞ্চানন, কি হচ্ছে?

—এই ভাই, ট্রেন্ করছি ঘোড়াকে।

—তুমি হর্স ট্রেনার হলে আবার কবে থেকে।

পঞ্চানন মাথা নেড়ে বলে, আর ভাই, শিক্ষা না দিলে নিজের ছেলেই গাধা হয়ে যায়, তা ঘোড়া তো পরের ছেলে।

—তা বেশ। কিন্তু তোমার দেনার কথাটা একেবারে ভুল গেছ! আমাদের পাড়াই মাড়াও না দু বছর থেকে—ব্যাপার কি?

পঞ্চানন আকাশ থেকে পড়ল, কীসের দেনা!

—সেই যে একদিন বাজারে নিলে। বছর দুই আগে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, চার আনা পয়সা। পদ্মার ইলিশ এসেছিল হাটে, পয়সা কম পড়ল, তোমার কাছে নিলাম বটে! মনে ছিল না ভাই।

জ্যোতিষ বোস ছেলেবেলা থেকেই হিসেবি, একথা পঞ্চানন জানতো। কিন্তু বুড়োবয়সে সে যে এত বেশি হিসেবি হয়ে উঠবে যে, চার আনা পয়সার কথা দু বছর

ধরে মনে করে রেখে ভিন গাঁ থেকে তিন মাইল হেঁটে চাইতে আসবে, পঞ্চানন তা ধারণা করতে পারেনি। বাপ পাঁচশ টাকা রেখে গেছল, সুদে খাটিয়ে তেজারথি কারবারে সেই টাকা পঞ্চাশ হাজারে সে দাঁড় করিয়েছে—কিন্তু সামান্য চার আনার মায়া সে ছাড়তে পারেনি ভেবে পঞ্চানন অবাক হল।

—তা ভাই পঞ্চানন, প্রায় আড়াই বছর হল তোমার ধার নেওয়া। আমার খাতায় সমস্ত হিসাব লেখা আছে; নিজে গিয়ে দেখতে পার একদিন। এইবার একটু গা করে দিয়ে দাও।

—কি যে বল তুমি? সামান্য চার আনা পয়সার জন্য আমি অস্বীকার করব? তা তুমি কষ্ট করে এত দূর এসে আমাকে লজ্জা দিলে। রাধু, তোর মার কাছ থেকে চার আনা নিয়ে আয় তো। আর বলগে তোর জ্যোতিষ কাকার জন্যে বেগুনি ভাজতে। বেগুনি দিয়ে তেল মেখে মুড়ি খেতে বেশ লাগে হে! তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা—

জ্যোতিষ বোস বাধা দিয়ে বলল, তা হবেখন! খাওয়া তো আর পালাচ্ছে না। কিন্তু একটা ভুল করছ তুমি, আড়াই বছর পরে পয়সাটা তো আর চার আনা নেই ভাই।

কিছু বুঝতে না পেরে পঞ্চানন বলল, চার আনা নেই কি রকম?

—আহা, বুঝতে পারছ না! সুদে আসলে তা পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে দাঁড়িয়েছে। পৌনে তিন পাই দেওয়া একটু শক্ত হবে তোমার পক্ষে, তা তুমি পাঁচ টাকা এগারো আনাই দাও আমায়।

—অ্যাঁ? পঞ্চাননের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাই! পৌনে তিন পাই দেওয়া তার পক্ষে শক্ত নিশ্চয়ই ওই বাজারে ওই পাই পাইয়া কে পাইয়ে দেয়! কিন্তু পাঁচ টাকা এগারো আনাটা দেওয়াই যে তার পক্ষে এমনকি সহজ, তা সে ভেবে পেল না।

পঞ্চানন ভেবে কিনারা পায় না। হ্যাঁ, জ্যোতিষটা ছেলেবেলা থেকেই খুব হিসেবি, একথা তার অজানা নয়, কিন্তু তার হিসেবিতা যে বয়সের সঙ্গে এতটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে, তা কে জানতো? নাঃ, জব্দ করতে হবে ওকে।

কাষ্ঠ-হাসি হেসে পঞ্চানন জবাব দেয়—তা নেবেই না হয় পাঁচ টাকা এগারো আনা। তোমাকে দিলে তো জলে পড়বে না। বস, জিরোও, গল্প কর—অনেকদিন পরে দেখা।

—হ্যাঁ, বসব বইকি! বেগুনি ও খাব! কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে মন্দ না—কিন্তু কচি শশা আছে তো?

পঞ্চানন মনে মনে মতলব এঁটে বলে, এতটা রোদে তিন কোশ দূর থেকে হেঁটে এসেছ, এই বয়সে এমন পরিশ্রম করা কি ভালো তোমার পক্ষে? একটা ঘোড়া রাখ না কেন? ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে হাঁটার পরিশ্রম হয় না, তাছাড়া রাইডিং একটা ভালো ব্যায়ামও। দেখছ না, আমিও একটা ঘোড়া রেখেছি।

জ্যোতিষ পঞ্চাননের ঘোড়ার দিকে দৃকপাত করে জবাব দেয়, বেশ ঘোড়াটি তোমার। দেখে লোভ হয়। আমিও অনেক দিন থেকে ভাবছি কথাটা। সত্যিই, এ বয়সে আর হাঁটা-চলা পোষায় না। কিন্তু মনের মতো ঘোড়া পাই কোথায়?

—কী রকম মনের মতো শুনি?

—এই ধর খুব তেজি হবে না, আস্তে আস্তে হাঁটবে। এই বুড়ো বয়সে যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই, তাহলে কি হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে? এবং হাড় ভাঙলে কি আর তা জোড়া লাগবে এই বয়েসে?

—তা সে রকম ঘোড়া কি আর পাওয়া যায়? কিনে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়। এই আমার ঘোড়াটা কি কম তেজি ছিল, অনেক কষ্টে ওকে শিক্ষিত করেছি। এখন যদি ওর পিঠে তুমি চাপ, তাহলে ও হাঁটছে বলে তোমার মনেই হবে না। এমন শান্ত, এত বিনয়ী, এরকম নম্র স্বভাব— মানে সুশিক্ষার যা কিছু সদ্‌গুণ, সব আছে এই ঘোড়ার।

—তা ভাই, তোমার এই ঘোড়াটির মতো শিক্ষিত ঘোড়া পাই কোথায়? আমি তো আর তোমার মতো ট্রেনার নই। তা তোমার ঘোড়াটি কত দিয়ে কিনেছিলে?

—দাঁওয়ে পেয়েছিলাম ভাই, মোটে পনেরো টাকায়।

—তা তুমি এক কাজ কর না, পঞ্চানন। পনেরো টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে ঘোড়াটা আমাকে দাও-না কেন? তোমার তো এগারো আনা পৌনে তিন পাই লাভ থাকল, তাছাড়া এতদিন চড়েও নিয়েছ। এই নাও দশ টাকার নোট—ধরো!

—না ভাই, ঘোড়াটা শিক্ষিত যে।

—আবার নতুন ঘোড়া সস্তায় কিনে শিখিয়ে নিতে পারবে—তোমার যখন ট্রেন করার ক্যাপাসিটি আছে! ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে বেশি লাভ নাই বা করলে। এই নোটখানা নাও, তোমার বাকি ধারও শোধ হয়ে গেল—তা নইলে ভেবে দেখ, পৌনে তিন পাই জোগাড় করা তোমার পক্ষে খুব শক্ত হত না কি?

পঞ্চানন হাসি চেপে আমতা আমতা করে বলে, তা তুমি যখন এত করে বলছ। ছেলেবেলার বন্ধুর একটা কথা রাখলাম না হয়। বেশ, নাও তুমি ঘোড়াটা।

—ভালোই হল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়েছে থানায়, যাচ্ছিলাম তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে। মনে করলাম পথে তো তোমার বাড়ি পড়বে, দেখা করে টাকাটা নিয়ে যাই। ভালোই করেছি। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের কাছে হেঁটে গেলে কি ভালো দেখাতো? ইজ্জত থাকত না।

জ্যোতিষ বোস ঘোড়ায় চেপে থানার দিকে রওনা হলেন। সত্যি, এমন শিক্ষিত ও শান্ত ঘোড়া প্রায় দেখা যায় না। পঞ্চানন যা বলেছিল, হাঁটছে বলে মনেই হয় না; অনেক তাড়াহুড়ো দিলে এক পা হাঁটে।

এদিকে পঞ্চাননও খুশি। নিশ্বাস ফেলে বলে, বাঁচা গেল এতদিনে! আপদ বিদায়, সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা লাভ! অশ্বমেধ করতে যাচ্ছিলাম, তা জ্যোতিষ বোসকে দেওয়াও যা, অশ্বমেধ করাও তো। পৌনে তিন পাই দেওয়া বেজায় শক্ত হত।

কেবল গিন্নি একটু দুঃখিত। তিনি মত প্রকাশ করেছেন—খেতে পেত না বেচারা, তাই ও রকম ছোঁ-ছোঁ করতো! ঘোড়ায় দানা খায়, ছোলা খায়, কত কি খায়—সে-সব ও কখনো চোখে দেখেনি। টর্চ খাবে, বেগুনি খেতে চাইবে, তা ওর দোষ কি! কথায় বলে পেটের জ্বালা

পঞ্চানন বলল, তাহলে ঘোড়াটার ভাগ্য বলতে হবে। জ্যোতিষরা বড়োলোক, সুখে থাকবে ওদের বাড়ি। আমরা গরিব মানুষ; নিজেদেরই দানা পাই না, কোথায় পাব ঘোড়ার খানা!

হেঁটে গেলে যতক্ষণে থানায় পৌঁছানো যেত, তার তিন গুণ সময় লাগল জ্যোতিষ বোসের ঘোড়ায় চেপে যেতে। কিন্তু জ্যোতিষ ভারী খুশি। এতখানি রাস্তা তিনি অশ্বারোহণে এসেছেন, কিন্তু একবারও পড়ে যাননি, কেবল ওঠার আর নামার সময় যা একটু কষ্ট হয়েছে। ওঠার সময় তিনি টুলে দাঁড়িয়ে চেপেছিলেন। কিন্তু নামবার সময় তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, যাতে ঘোড়াটা হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ে আর তাঁর পক্ষে নামাটা সহজ হয়, কিন্তু ঘোড়াটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, একটু কাত হল না পর্যন্ত। তাঁর আশা ছিল শিক্ষিত ঘোড়া তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবে, কিন্তু ঘোড়াটা না বুঝল তাঁর ইঙ্গিত, না কান দিল তাঁর সাধ্যসাধনায়। বাধ্য হয়ে তাঁকে অনেকটা প্রাণের মায়া ছেড়েই, লাফিয়ে নামতে হল, কিন্তু সুখের বিষয় তাঁর হাড়গোড় ভাঙেনি কিংবা তিনি একটুও জখম হননি।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে জ্যোতিষ বোসের আগে থেকেই আলাপ ছিল। জ্যোতিষ সেলাম ঠুকতেই তিনি 'হ্যালো মিস্টার বোস' বলে তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে